Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-IV, July 2024, Page No.01-08
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পরিবেশ সচেতনতা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের বিকাশ ও তার ভবিষ্যৎ: একটি পর্যালোচনা

অনন্যা সরকার

গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Rabindranath Tagore possessed versatile talents in the form of poet, lyricist, essayist, novelist, dramatist & painter. He is considered as well-known and respected person to all. Nature and environment are inextricably linked with human life. With the development of modern civilization, natural environments began to suffer. Air pollution, water pollution, soil pollution, and noise pollution have affected the way of life of mankind. The prevalence of diseases and natural calamities has increased.

Again development has widened the gap between cities and villages. Development has not reached to all stages of society equally and poor working people have been deprived from such opportunities.

Rabindranath realized that education, self-help technology are needed for the improvement of society. As well as to spread development facilities among the people of all levels.

We are impressed by his various descriptions of the natural environment, deep environmental awareness and the need for sustainable development, as well as his discussions and initiatives.

His activities will show a new direction towards the future generation.

Keywords: Rabindranath Tagore, Nature, Environment, Pollution, Human, Sustainable Development.

মূল আলোচনা: রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, চেতনায় ও অনুভবে একদিকে যেমন প্রকৃতির শস্যশ্যামলা রূপের বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে তেমনি আধুনিক সভ্যতার নেতিবাচক প্রভাবে প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণ ও প্রভাবগুলিও চিহ্নিত হয়েছে। মানুষের বিবেচনাহীন কার্যাবলী ও অসচেতনতার ফলস্বরূপ প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে, যার ভয়ঙ্কর পরিণতি সমগ্র জীবজগৎকেই ভোগ করতে হচ্ছে। পরিবেশ দূষণের প্রভাবে মানুষ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বহু ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশসচেতনতামূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোকপাত করে সুস্থায়ী

উন্নয়নের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি মনে করেছেন মানুষের জীবনের উন্নতিসাধনের প্রয়োজনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি এর ফলে যেন প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকেও আলোকপাত করেছেন। জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, ন্যায়বিচারের মতো সুযোগ-সুবিধাগুলি পৌঁছানো প্রয়োজন। তবেই মানুষের আত্মশক্তি জাগরিত হবে, আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ফলে সমাজের সামগ্রিক বিকাশ সাধন হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন প্রবন্ধ যেমন 'পল্লীপ্রকৃতি', 'হলকর্ষণ', 'উপেক্ষিতা পল্লী', 'পল্লীসেবা', 'শহর ও নগর', 'বিলাসের ফাঁস', 'দেশের কাজ' ইত্যাদির কথা বলা যায় যেখানে তাঁর পরিবেশভাবনার চিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। এছাড়া 'দুই- পাখি', 'বসুন্ধরা', 'প্রশ্ন', 'বৃক্ষরোপণ', 'সভ্যতার প্রতি' প্রভৃতি কবিতা; তাঁর চিঠিপত্রের সংকলন 'ছিন্ন-পত্রাবলী' হতে তাঁর গভীর পরিবেশসচেতনতা ও সুস্থায়ী উন্নয়ন সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনার অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত। এই আলোচনার মধ্যে পরিবেশের উপর আধুনিক সভ্যতার প্রভাব, পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব ও সুস্থায়ী উন্নয়ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভিমত ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

পরিবেশের উপর আধুনিক সভ্যতার প্রভাব প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ: আদিম যুগে জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষ কাঠ ও পাথরের তৈরি অস্ত্র দিয়ে জীবজন্তুর শিকার করে নিজ ক্ষুধানির্বাহ করত। মানুষ আগুন আবিষ্কারের সাথে সাথেই প্রকৃতির শক্তিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শেখে। ক্রমশ পশুশিকারের পাশাপাশি মানুষ মাটিতে ফসল ফলাতে শুরু করে। এভাবে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে তাঁর 'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে বলেছেন-- 'প্রথম যেদিন সে লাঙল তৈরি করে মাটির উর্বরতা শক্তিকে কর্ষণ করতে পারলো, সেদিন তার জীবনযাত্রার ইতিহাসে কত বড় পর্দা উঠে গেল'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৫১)

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। যে মানুষ একসময় অরণ্যে নিবাস করতো সেই মানুষই আবাসস্থল নির্মাণের প্রয়োজনে বনভূমিকে গ্রাস করতে থাকলো। এভাবে গ্রামীণ সভ্যতা হতে নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ ঘটলো।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মানুষের উপর প্রকৃতির প্রভাবকে ও প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করার প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ নিজ লেখনির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা রাখেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রকৃতির রহস্যভেদ করতে ও প্রকৃতির উপর নিজ আধিপত্য স্থাপনকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকনিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করে। সেখানে ভারতীয় সভ্যতা অরণ্যের ছত্রছায়ায় লালিত হয়েছিল। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন ---'পাশ্চাত্য প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করে চলেছে--- এ তার গর্ব। তার ভাবনায় আমরা যেন এক প্রতিকূল জগতে বাস করছি, সেখানে সবই আমাদের অচেনা। সেখান থেকে আমরা যা চাই তা লাভ করতে হবে জোর করে। এই আবেগ পুরপ্রাচীর গড়ে তোলার অভ্যাসের ফসল, কেননা এই পৌর জীবনেই মানুষের মধ্যে এই স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়, সে কেবল নিজের জীবন ও কর্মের দিকটাই প্রভাসিত করে এবং নিজের ও বিশ্বজনীন প্রকৃতির মধ্যে এক কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করে, অথচ এই প্রকৃতির বক্ষেই তো আমাদের কালাতিপাত। কিন্তু ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ ছিল স্বতন্ত্র; তার কাছে মানুষ ও জগৎ মিলেই একটি মহান সত্য, ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে যে সংহতি রয়েছে, সে গুরুত্ব দিয়েছিল সেই সংহতির উপর।...

ভারতবর্ষে সৃষ্টির মূল সংহতি নিছক দার্শনিক কল্পনা ছিল না, অনুভূতি ও কর্মে এই সংহতির উপলব্ধিই তার জীবনের ব্রত। কর্ম, ধ্যান এবং নিয়ন্ত্রিত জীবনের সহায়ে সে এমনই চেতনায় উন্নীত হয়েছিল যে, তার কাছে সবকিছুই ছিল আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ। এই পৃথিবীর মাটি, জল, আলো, ফুল, ফল প্রভৃতি তার কাছে কায়ামাত্র ছিল না, যেগুলিকে ব্যবহার করে ফেলে দিতে হবে। ঐকতান সৃষ্টিতে প্রতিটি সুর যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি এসবই ভারতবর্ষের কাছে পূর্ণতার আদর্শলাভের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক ছিল'। (রায়, ২০২১, পৃষ্ঠা - ১০-১১)

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়েই যেন এই বিশ্বজনীনতার আদর্শকে অনুসরণ করে। এতে সমগ্র বিশ্ববাসীর কল্যাণ নিহিত আছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিকূলতা অনেকাংশে দূরীভূত হয়। উৎপাদনব্যবস্থার অগ্রগতির সাথে সাথে কলকারখানার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলো, যোগাযোগব্যবস্থা উন্নত হতে লাগলো। আধুনিক সভ্যতায় মানুষের জীবনের অগ্রগতি ঘটলেও সেটি প্রকৃতিকে ক্রমাগত দূষিত করে চলেছে। জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাবের ফল মানবসমাজকে বিভিন্ন জটিল রোগব্যাধির মাধ্যমে ভোগ করতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন --- '...যা খাইয়া শরীর বল পায় ও ব্যাধিকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে তাহার কী অবস্থা! ঘি দূষিত, দুধ দুর্মূল্য, মাংস দুর্লভ, তৈল বিষাক্ত। যে কয়টা স্বদেশি ব্যাধি ছিল তাহারা আমাদের যকৃত- প্লীহার উপর সিংহাসন পাতিয়া বসিয়াছে; তাহার উপর বিদেশী ব্যাধিগুলা অতিথির মতো আসে এবং কুটুম্বের মতো রহিয়া যায়।ডিপথিরিয়া, রাজযক্ষ্মা, টাইফয়েড সকলেই এই রক্তহীনদের প্রতি এক্সপ্লয়টেশন নীতি অবলম্বন করিয়াছে'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৫)

এখন দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক শক্তির প্রাধান্যের পরিবর্তে যান্ত্রিক শক্তির প্রাবল্যে প্রকৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। যার ক্ষতিকর প্রভাব মানুষের জীবনযাত্রাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। মানুষের আবিষ্কৃত যন্ত্রের উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুচিন্তিত অভিমত হল ---'মানুষ যেমন একদিন হাল-লাঙলকে, চরকা-তাঁতকে, তীর-ধনুককে, চক্রযান-যানবাহনকে গ্রহণ ক'রে তাকে নিজের জীবনযাত্রার অনুগত করেছিল; আধুনিক যন্ত্রকেও আমাদের সেই রকম করতে হবে'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৫৩)

তবে রবীন্দ্রনাথ কখনোই প্রগতিবিরোধী ছিলেন না। তিনি চাইতেন মানুষের জ্ঞানের বিকাশ হোক, সভ্যতারও বিকাশ হোক কিন্তু সেটি যেন কখনোই পরিবেশের ক্ষতি না করে। তিনি বলেন--- 'প্রকৃতির দান ও মানুষের জ্ঞান এই দুইয়ে মিলেই মানুষের সভ্যতা নানা মহলে বড় হয়েছে--- আজও এই দুটোকেই সহযোগীরূপে চাই। মানুষের জ্ঞান যেখানে কোনো পুরোনো অভ্যস্ত রীতির মধ্যে আপন সম্পদকে ভাণ্ডারজাত করে ঘুমিয়ে পড়ে সেখানে কল্যাণ নেই। কেননা; সে জমা নিয়ত ক্ষয় হচ্ছে, তাই এক যুগের মূলধন ভেঙে ভেঙে আমরা বহুযুগ ধ'রে নিয়ে চালাতে পারব না'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৫৪)

তবে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ পরিবেশকে বিপর্যস্ত করছে আবার মানুষের মনে কৃত্রিমতা তৈরি করে তার আবেগ, অনুভূতিকে গ্রাস করে তাকে প্রকৃতির সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে প্রেরিত করে চলেছে। তিনি তাঁর 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ক্ষতিকারক দিকগুলির উল্লেখ করে বনভূমির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি...'(ঠাকুর, ১৯২৭,পৃষ্ঠা - ৩৬)

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবনার সাথে ফরাসি দার্শনিক রুশোর আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার মিল লক্ষ্য করা যায়। রুশো মনে করেন আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষকে প্রকৃতির রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে তার মধ্যে তার স্বাভাবিকতাকে, মানবিক সত্তাকে অপহরণ করে নিচ্ছে। শিল্প ও বিজ্ঞান মানুষের নৈতিকতাকে কলুষিত করেছে। যৌক্তিকতা বেড়াজালে পড়ে মানুষ আবেগ অনুভূতি হারিয়ে কৃত্রিমাতাকে বরণ করেছে। মানুষ যান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। তাই পরিণত মানবিক সত্তার প্রয়োজনে তিনি প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যেতে বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটিতে দেখা যায়, মানুষের সীমাহীন লোভ কিভাবে প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তুলছে। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে সেটি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন--- 'কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী --- এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম দ্বন্দ্ব আছে---কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে নিয়ে কলিযুগ কৃষিপল্লিকে কেবলি উজাড় ক'রে দিচ্ছে। তাছাড়া, সভ্যতার ক্ষুধা- তৃষ্ণা, দ্বেষ-হিংসা, বিলাপ -বিভ্রম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মত'। (ঠাকুর, ১৩৩৩, পৃষ্ঠা - ৩)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে মানুষ বাঁধ নির্মাণ করে প্রকৃতির জলধারাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃতির উপর অবিচার করে তার বর্ণনা করেছেন। আবার, আধুনিক যন্ত্রদানব কিভাবে প্রকৃতিকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে গিয়ে প্রকৃতিকে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং এর ফলাফল মনুষ্য প্রজাতিকে ভুগতে হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন---'তোমার চিঠিতে তুমি যে 'machine' সম্পর্কে যে আলোচনার কথা লিখেছো সেই 'machine' এই নাটকের একটা অংশ...যন্ত্র দিয়ে যারা মানুষকে আঘাত করে তাদের একটা বিষম শোচনীয়তা আছে ; কেননাযে মনুষ্যত্বকে তারা মারে সেই মনুষ্যত্ব যে তাদের নিজের মধ্যেও আছে --- তাদের যন্ত্রই তাদের নিজের ভিতরকার মানুষকে মারছে'। (ঠাকুর, ১৯৫৭, পৃষ্ঠা - ৮৫)

পরিবেশ দূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎবাণী: আজকের বিশ্ব বহুমাত্রিক পরিবেশ দূষণের শিকার। জলদূষণ, বায়ুদূষণ, মৃত্তিকাদূষণ, শব্দদূষণের কুফল মনুষ্যপ্রজাতিকে প্রতিনিয়ত ভোগ করতে হচ্ছে। উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে চলেছে।

পৃথিবীতে আজ অত্যাধিক জনসংখ্যার চাপের ফলে অল্প সময়ে অধিক মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে। হাইব্রিড শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার রবীন্দ্রনাথের সময় ব্যাপকভাবে প্রচলিত না থাকলেও তাঁর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনায় তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্বল্প সময় অধিক দান আদায় প্রক্রিয়া কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত 'উপেক্ষিতা পল্লী' প্রবন্ধ হতে জানা যায়--- 'বাগানে দেখতে পাওয়া যায় কোনো কোনো গাছ ফলফুল উৎপাদনের অতিমাত্রায় নিজের শক্তিকে নিঃশেষিত করে মারা যায় তার

অসামান্যতার অস্বাভাবিক গুরুভারই তার সর্বনাশের কারণ হয়ে ওঠে, প্রকৃতিতে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৮০)

শিল্পায়ন, নগরায়নের নামে যেভাবে বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছে; ফসলি জমির যে ক্ষতি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পরিবেশরক্ষার ব্যাপারে সোচ্চার হয়েছিলেন। তাঁর চিন্তার পরিধি কেবল ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, সমগ্র বিশ্বের পরিবেশে ক্ষতিগ্রস্ততায় তাঁকে ব্যথিত করেছিল। 'অরণ্য দেবতা'-য় তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন----'মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো বন ধ্বংস করা হয়েছে, তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রকে নষ্ট করছে,চাপা দিচ্ছে'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৮৭)

প্রকৃতির শক্তিকে মানুষ অন্যায়ভাবে ব্যবহার করার ফলে পৃথিবীর ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে, যার ফলস্বরূপ Global Warming, Climate Change- এর মত বিশ্বজনীন সমস্যাগুলি দেখা যাচ্ছে। এই সমস্যাগুলির সমাধান না হলে এই পৃথিবী জীবদের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়---

> 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু,
> নিভাইছে তব আলো,
> তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো,
> তুমি কি বেসেছ ভালো?'... (ঠাকুর, ১৩৫৪, পৃষ্ঠা - ৬৬)

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বর্তমানে পরিবেশবাদীদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে অরণ্যসম্পদ সীমিত হয়ে পড়ছে। বৃক্ষচ্ছেদনের ফলাফল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধ হতে জানা যায়--- 'মানুষ অমিতচারী। যতদিন সে অরণ্যচর ছিল ততদিন অরণ্যের সঙ্গে পরিপূর্ণ ছিল তার আদানপ্রদান, ক্রমে সে যখন নগরবাসী হল তখন অরণ্যের প্রতি মমত্ববোধ সে হারালো... লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতি ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝড়ে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান, আপনার কল্যান বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করেছে'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ৮৭)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী সম্মেলনের অভিভাষণে জলচক্র ও মৃত্তিকাক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে বিশদে বলেন---'মাটি থেকে যে প্রাণের উৎস উৎসারিত হচ্ছে তা যদি চক্রপথে মাটিতে না ফেরে তবে তাতে প্রাণকে আঘাত করা হয়। পৃথিবীর নদী বা সমুদ্র থেকে জল বাষ্পাকারে উপরে উঠে, তারপর আকাশে তা মেঘের আকার ধারণ করে বৃষ্টিরূপে আবার নিচে নেমে আসে। যদি প্রকৃতির এই জলবাতাসের গতি বাধা পায় তবে চক্র সম্পূর্ণ হয় না, আর অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি উৎপাত এসে জোটে। মাটিতে ফসল ফলানো সম্বন্ধে এই চক্ররেখা পূর্ণ হচ্ছে না বলে আমাদের চাষের মাটির দারিদ্র বেড়ে চলছে...মানুষ তার ও প্রকৃতির মাঝখানে আর একটি জগতকে সৃষ্টি করেছে যাতে প্রকৃতির সঙ্গে তার আদান প্রদানের যোগ-প্রতিযোগে বিঘ্ন ঘটছে। যে ইঁট কাঠের প্রকাণ্ড ব্যবধান তুলে দিয়ে মাটির সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে... মানুষ প্রাণের উপকরণ যদি মাটিকে ফিরিয়ে দেয় তবেই মাটির সঙ্গে তার প্রাণের কারবার ঠিকমত চলে, তাকে ফাঁকি দিতে গেলেই নিজেকে ফাঁকি দেওয়া হয়'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ১১৭-১১৮)

মানুষের অসচেতনতা ও অসাবধানতার ফলে সমুদ্রের জল কিভাবে দূষিত হচ্ছে তার বর্ণনা পাই তাঁর 'জাপানযাত্রী' প্রবন্ধ থেকে। 'এমনি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপর তেল ভাসছে। মানুষের আবর্জনাকে বরং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারছে না'। (ঠাকুর, ১৪২২, পৃষ্ঠা - ৪)

এছাড়া তাঁর 'জলোৎসর্গ' প্রবন্ধে আমরা জলদূষণের ক্ষতিকারক প্রভাব সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারাকে লক্ষ্য করি। সুজলা- সুফলা ভারত কিভাবে জনসংকটের সম্মুখীন হয়েছে সেটি তিনি বর্ণনা করেছেন--- 'যে জল পবিত্র করে সে স্বয়ং হয়েছে অপবিত্র। পঙ্কবিলীন ---যে করে আরোগ্যনিধান সে আজ রোগের আকর.... বারে বারে বন্যা এসে মারছে আমাদের দেশকেই।... প্রধান কারণ এই যে পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ ও জলাশয়তল বহুকাল থেকে অবরুদ্ধ ও অগভীর হয়ে এসেছে। বর্ষণজাত জল যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করবার শক্তি তাদের নেই'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ১৬২-১৬৩)

রবীন্দ্রনাথ ও সুস্থায়ী উন্নয়ন: উন্নয়ন বলতে একটি প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় যা সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং প্রাকৃতিক দিকে উন্নতি ও প্রগতি নিশ্চিত করে। উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে যাতে প্রাকৃতিক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বলে সুস্থায়ী উন্নয়ন (Sustainable Development)। এই সুস্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর প্রক্রিয়া যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি না করে সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রেখে পরিকল্পনা করা হয়। সুস্থায়ী উন্নয়ন কেবলমাত্র পরিবেশ সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয় বরং সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নও এর অন্তর্ভুক্ত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখনী, কর্ম ও গৃহীত উদ্যোগগুলির মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পরিক নির্ভরতাকে উপলব্ধি করাতে চেয়েছেন। সুস্থায়ী উন্নয়নের দিকগুলিকে তিনি বাস্তবায়নের জন্য সাধ্যমত প্রচেষ্টা করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে 'বৃক্ষরোপণ' ও 'হলকর্ষণ' উৎসবের কথা বলা যায়। ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে উত্তরায়ণে প্রথম 'বৃক্ষরোপণ' উৎসবের সূচনা হয়। শ্রীনিকেতনের মানুষদের কৃষিকাজে উৎসাহ দিতে ১৯২৮ সালে 'হলকর্ষণ' উৎসবের সূচনা করেন। এছাড়া বর্ষামঙ্গল উৎসব, বসন্ত উৎসবের মত ঋতুনির্ভর অনুষ্ঠানগুলির কথা বলা যায় যেগুলি মানুষ ও প্রকৃতির বন্ধন দীর্ঘ করার লক্ষ্যে তিনি সূচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আধুনিক সভ্যতা বিকাশের ফলে গ্রাম ও শহরের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। জীবন -জীবিকার সন্ধানে মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করা শুরু করে। এর ফলে গ্রামগুলি ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে পড়তে শুরু করে। এই সমস্যার সমাধানের জন্য রবীন্দ্রনাথ চিন্তাভাবনা করেন। তিনি উপলব্ধি করেন সমবায় ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রামীণ পুনর্জাগরণ সম্ভব যা ভারতে সুস্থায়ী উন্নয়ন বাস্তবায়িত করতে সহায়ক হবে, গ্রামের মানুষদের মধ্যে আত্মশক্তি, আত্মনির্ভরতা, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বিকাশের উপর তিনি জোর দেন। 'সমবায় নীতি'-তে তিনি গ্রামীণ পশ্চাৎপদতার কারণ হিসেবে কৃষি জমির খণ্ডীভবন, বাজারের সমস্যা, যান্ত্রিকীকরণ,অর্থাভাব ও সুদখোর মহাজনী শোষণকে দায়ী করেন। তাঁর মতে সমবায় গঠনের মাধ্যমে ওইসব সমস্যার সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন ---'আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র থেকে বাঁচব।... দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনক্ষম করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য কতগুলি পল্লী নিয়ে এক-একটি মণ্ডলী

স্থাপন করা দরকার, সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্মের ও অভাবমোচনের ব্যবস্থা করে মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্যাপ্ত করে তুলতে পারে তবেই স্বায়ত্তশাসনের চর্চা দেশের সর্বত্র সত্য হয়ে উঠবে। নিজের পাঠশালা, শিল্পশিক্ষালয়, ধর্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডর ও ব্যাঙ্কস্থাপনের জন্য পল্লীবাসীদের শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহদান করতে হবে। এমনি করে দেশের পল্লীগুলি আত্মনির্ভরশীল ও ব্যূহবদ্ধ হয়ে উঠলেই আমরা রক্ষা পাব'। (ঠাকুর, ১৩৬০, পৃষ্ঠা -১৮-১৯)

শিলাইদহে থাকতে রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু জমিদারির কাজের ফাঁকে ও প্রতিকূল পরিস্থিতির দরুন সেটি পূর্ণাঙ্গভাবে করে উঠতে পারেননি। সেই অপূর্ণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটেছিল শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে। আবার, রবীন্দ্রনাথ নিজ জমিদারিতে প্রজাদের মধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘ-কর্ম ও সঞ্চয় অভ্যাস শিক্ষা দেবার জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করেছিলেন, এই ব্যাঙ্কই 'পতিসর কৃষি ব্যাঙ্ক' নামে পরিচিত হয়েছিল। এছাড়া কৃষক প্রজাদের আত্মসম্মান ও আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল 'লোকসভা'। শিলাইদহ, পতিসর অঞ্চলে রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন প্রকল্প, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে কৃষি ও হস্তশিল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভরতার উদ্যোগ এক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন---'বাবা বললেন, তিনি যখন জমিদারির কাজ দেখতে আরম্ভ করেন প্রথমেই প্রজাদের মধ্যে সালিশী বিচারের প্রবর্তন করেন। বিহারিমপুর ও কালিগ্রাম এই দুই পরগনা কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিবাদ ঘটলেই উভয়পক্ষকে এই বিচারসভায় উপস্থিত হতে হবে এই নিয়ম হল। প্রজারা ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনরকম মামলা নিয়ে আদালতে যাবে না'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা -২৩৯)

১৯০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ পাঠ করেছিলেন সেই ভাষণের বিষয়বস্তু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা হতে জানা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন--- 'কবি তাঁর ভাষণে, সে কথা 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে প্রায় চার বৎসর পূর্বে বলেছিলেন সেই কথাই আরো স্পষ্ট করে এবার বললেন। গ্রামের মধ্যে সমবায়নীতির প্রচলন, 'মিতশ্রমিক যন্ত্রের পরিচালনা', সঙ্গবদ্ধভাবে বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান, বিচিত্র কুটির শিল্পের প্রবর্তন বহু পন্থা নির্দেশ করলেন। আর বললেন যে এই সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে শক্তিলাভ, সংঘশক্তি ছাড়া কোনো জাতি কোনো স্থায়ী মর্যাদা ও সাফল্য লাভ করতে পারে না'। (মুখোপাধ্যায়, ২০২২, পৃষ্ঠা - ৭২)

১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন লাগোয়া সুরুল গ্রামে একটি পুরনো কুঠিবাড়ি ও কুঠিবাড়ি লাগোয়া বিস্তীর্ণ জমি কিনে নেন। এভাবে সুরুল গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে থাকে শ্রীনিকেতনের পল্লী সাংগঠনিক কর্মযজ্ঞ। এই কাজে অন্যতম সহায়কের ভূমিকা পালন করেন রবীন্দ্র অনুরাগী কৃষিবিদ লেনার্ড এলমহার্স্ট। তাঁর উদ্যোগেই শ্রীনিকেতনে কৃষি গবেষণা শুরু হয়। অর্থসাহায্য করেন ডরোথি স্ট্রেট। সঙ্গে হস্তকারুশিল্পের বিষয়ে গবেষণা শুরু হয়।

গ্রামীণ হস্তশিল্পের প্রতি ভালোবাসা ও প্রশংসা জানালেও রবীন্দ্রনাথ গ্রামের উন্নয়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সমবায় -প্রচেষ্টাকে সফল করে তোলার জন্য ও গ্রামের সাধারণ মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লেখা পত্রাংশ থেকে এ বিষয়ে আভাস পাওয়া যায়। 'বোলপুরে একটা ধানভানা কল চলচে--সেই রকম একটা কল এখানে (পতিসরে) আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে।... তারপরে এখানকার চাষাদের কোন Industry

শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। ---এদের থাকবার মধ্যে কেবল শক্ত এঁটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিসটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা।...ছোটখাটো Furnace আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা'। (ঠাকুর, ১৯৬২,পৃষ্ঠা - ২৪৬)

রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা দূর করে সচেতনতা বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। এই শিক্ষাকে সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে হবে। তার জন্য গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সকল স্থানেই প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। তিনিও গণশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেছেন---'এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ হতে বঞ্চিত---ভারতবর্ষে তো প্রায় অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ হতে বঞ্চিত...একটুখানি ছিটেফোঁটা শেখানো না ---গোড়া থেকেই বিজ্ঞান ধরিয়ে দেওয়া দরকার, বিশেষত ফলিত বিজ্ঞান....সমবায়প্রণালীর তত্ত্ব ওদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ করতে হবে, তারপরে শরীরবিজ্ঞান'। (ঠাকুর, ১৯৬২, পৃষ্ঠা - ১৮৫-১৮৬)

শান্তিনিকেতন আশ্রমে আদর্শ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা, সমবায়ের ভিত্তিতে পল্লীবাসীদের স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা, শ্রীনিকেতনে ব্যবহারিক বিদ্যাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্মের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশীবাসী আত্মশক্তির বিকাশের মাধ্যমে দেশের উন্নতি ও প্রগতি চেয়েছিলেন।

পরিশেষে বলা যায় --- আধুনিক সভ্যতায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিত্যনতুন আবিষ্কারের ফলে মানুষের কাছে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে, জ্ঞানভাণ্ডারে প্রতিনিয়ত নতুন তথ্য সংযোজিত হচ্ছে, পণ্য ও পরিষেবাপ্রাপ্তির পথ সুগম হচ্ছে; তেমন ঊর্ধ্বমুখী শিল্পায়ন, পরিকল্পনাবিহীন নগরায়ন, বল্গাহীন অরণ্যচ্ছেদন, বিবেচনাহীনভাবে কীটনাশক প্রয়োগ, কৃত্রিম রাসায়নিকের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, জলাশয়ে বর্জ্যদ্রব্য নিষ্কাশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ও এর ফলস্বরূপ মানুষের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে, পরিবেশদূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, বন্যা, ভূমিকম্প, ধ্বস, মরুবিস্তার, বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে কুমেরুপ্রদেশের বরফগলনের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলি ঘটে চলেছে, যার ক্ষতিকারক প্রভাবে বাস্তুতন্ত্র ও জীববৈচিত্র সংকটের মুখে পতিত হয়েছে। উন্নয়নের নামে অপরিকল্পিত ও সংকীর্ণ স্বার্থান্ধ কার্যকলাপ মানুষ সহ জীবজগতের সুষমা, সাম্য ও সুস্থিতিকে নষ্ট করছে। শিল্পায়ন, নগরায়ন ও উন্নত প্রযুক্তির প্রসারের ফলে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম- শহরের পার্থক্য, সুবিধাভোগী-সুবিধাবিহীন, উন্নত-অনুন্নতের মধ্যে পার্থক্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের প্রান্তিক পর্যায়ে মানুষ এখনো অনেক সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত। উন্নত দেশগুলো নিজেদের সংস্কৃতি, মূল্যবোধকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে উন্নতিকামী ও অনুন্নত দেশগুলির উপর চাপিয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন। এর ফলে বিভিন্ন নৃকুলগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা, বৈচিত্র্যতা ও মূল্যবোধ আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি হতে পরিবেশ ও মানবসমাজের বিপর্যয়--- কোনটাই এড়িয়ে যেতে পারেনি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আশা, হতাশা, সম্ভাবনা ও বিপর্যয়-- তিনি তার দীর্ঘজীবনে নিবিড়ভাবে দেখেছেন ও অনুভব করেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও সমাজ অর্থনীতিতে এর প্রভাব তাঁকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। সভ্যতার সংকট তাঁকে তাঁর জীবনের শেষবেলাতেও শঙ্কিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন যে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন তবে তা কখনোই যেন প্রকৃতি ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে---সেটি খেয়াল রাখতে হবে।

উন্নয়ন হওয়া উচিত দীর্ঘস্থায়ী যেখানে আগামী প্রজন্ম একটি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে বসবাস করতে পারে। আজ থেকে বহু বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।তিনি তাঁর কর্মজীবনে জমিদারির কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে সাথে আজীবন নিজেকে সৃজনশীল ও সম্মিলিত চিন্তা ও কর্মে নিয়োজিত রেখেছিলেন। ব্যষ্টি অপেক্ষা সমষ্টিগত কল্যাণ তাঁর কাছে প্রাধান্যলাভ করেছিল। সংকীর্ণতার পরিবর্তে বিশ্বজাগতিকতার তাঁর কাছে গুরুত্বলাভ করেছিল। যার ফলস্বরূপ পশ্চিমের উগ্রজাতীয়তাবাদের তিনি সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর পরিবেশচিন্তা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের ধারণাতেও তাঁর এই প্রসারিত চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তিনি যেমন মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধকে দৃঢ় করতে বৃক্ষরোপণ, বর্ষামঙ্গল, বসন্ত উৎসবের সূচনা করেন তেমনি তিনি গ্রামীন মানুষদের উন্নতি ও বিকাশসাধনের উদ্দেশ্যে 'সমবায়নীতি'-র উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যেখানে গ্রামীণ পুনর্গঠন করে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি সহ অন্যান্য সামাজিক সুযোগ -সুবিধা দানের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষদের আত্মনির্ভর হতে সহায়তা করার প্রচেষ্টা রাখা হয়েছিল। বর্তমানে পরিবেশগত সমস্যা ও সুস্থায়ী উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা বিশ্বব্যাপী। ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 'Millenium Development Goals' -এ আটটি লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছিল। সেখানে সুস্থায়ী উন্নয়নকে নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছিল। আবার ২০১৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ 'Sustainable Development Goals' (SDGs)-এর ১৭ টি বিশ্বজনীন লক্ষ্যমাত্রার কথা বলে যেখানে-- দারিদ্র দূরীকরণ, ক্ষুধা দূরীকরণ, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, নিরাপদ জল ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা, সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি, যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, অসমতা হ্রাস, সুস্থায়ী নগর ও সমাজ, দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, জলবায়ু কার্যক্রম, জলজ জীবন, স্থলজ জীবন, শান্তি ও ন্যায়বিচার কার্যকর প্রতিষ্ঠান, লক্ষ্যপূরণের অংশীদারীত্ব প্রভৃতি সুস্থায়ী উন্নয়নের বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর থেকে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশচিন্তা ও সুস্থায়ী উন্নয়ন সম্পর্কিত ভাবনার প্রাসঙ্গিকতাই প্রতিফলিত হয়। যথার্থভাবে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ ভাবনায় মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য, আমাদের ভাবী প্রজন্মকে সুন্দর বিশ্ব উপহার দেবার জন্য প্রকৃতিমায়ের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন গুরুত্ব পেয়েছে। প্রকৃতির উপর প্রভুত্বস্থাপনের ভাবনার পরিবর্তে প্রকৃতির সুর-তাল- লয়কে অনুভব করতে হবে। প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করতে হবে, নিজেদের জীবনযাত্রাকে গড়ে তুলতে হবে, তবেই পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান সুনিশ্চিত হবে।

গ্রন্থপঞ্জি :

1) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৬২) *পল্লীপ্রকৃতি*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
2) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৫৭) *চৈতালি*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
3) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৩৩) *রক্তকরবী*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
4) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৯৫৭) *মুক্তধারা*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
5) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৫৪) *পরিশেষ*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
6) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৪২২) *জাপান-যাত্রী*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী।
7) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬৯) *স্বদেশী সমাজ*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী।

8) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৬০) *সমবায়নীতি,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী।
9) রায়, সুনীল (২০২১) *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাধনা,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
10) মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার (২০২২) *রবীন্দ্র জীবনকথা,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।
11) মজুমদার, আদিত্যপ্রসাদ (১৯৭৪) *চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ,* কলকাতা, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি।

Websites:

1) বিশ্বাস, জয়ন্তকুমার (n.d.) *প্রকৃতি ও পরিবেশ: রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও ভাবনায়.* Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Jayanta-Biswas-3/publication/306079025_Nature_and_Environment_In_Rabindranath%27s_Words_and_Thoughts_Prakriti_o_Paribesh_Rabindranather_Bhashay_o_Bhabnay_in_Bengali/links/597f1b14458515687b4a4ece/Nature-and-Environment
2) রহমান, ড. আতিউর (২০১৯, মার্চ ৯) *রবীন্দ্রনাথ ও টেকসই উন্নয়ন.* Retrieved from abnews.24.com: https://www.abnews24.com/free-opinion/32736/%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%A5-%E0%A6%93-%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%B8%E0%A6%87-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8